মুহিনের গান, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং প্রতারিত জনগন

যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে সদ্যজাত আদরের প্রিয় জ্যৈষ্ঠ নাতির নাম রেখেই মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নানা। আর ফিরলেন না, লাশ হয়েও না। বুঝ অবুঝ পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বামীর লাশটাকে জড়িয়ে ধরে যে নানী প্রাণভরে কাঁদবেন, সে সৌভাগ্যও তার হয়নি। একমাত্র প্রিয় চাচার কথা মনে করে মা আজো চোখের পানি ফেলে শান্তি খোঁজেন। পাবনা থেকে সিলেটে গিয়ে কবর জেয়ারত করা ফি বছর তো আর সম্ভব না। তাই প্রতিবছরই এপ্রিলের ৪ তারিখে নানী নিজ বাড়িতে বসেই কিছু লোকজন নিয়ে অতিরিক্ত দোয়া-দরুদ পড়েন স্বামীসহ সব শহীদদের রুহের মাগফেরাতের আশায়। নাতি মুহিনের (যার জন্ম হয়েছে স্বাধীনতারও এক যুগ পর) 'যে মাটির বুকে লুকিয়ে আছে লক্ষ মুক্তিসেনা, তোরা দে না, দে না সে মাটি মোর অংগে মাখিয়ে দে না' গানটি শুনে নানী তাঁর অবর্ননীয় যাতনা ও দুঃসহ স্মৃতি আর মা, মামা-খালারা বিস্মৃত সাগরের অতল সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া অতি আপনজনের স্মৃতি নতুন করে রোমন্থন করে গোটা পরিবার কেঁদে কেটে একাকার। একান্ত পারিবারিক এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য হল স্বজন হারানো হাজারো শহীদ পরিবারের খন্ডিত আবেগের কদাংশ তুলে ধরা। এই অবদমিত আবেগ যদি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অসমাপ্ত পুঁজি বিনিয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে জাতি হিসেবে আমরা বারে বারে প্রতারিত হই।

স্বাধীকারের আবেগমাখা আন্দোলন বিধ্বস্ত ও ক্লান্ত জাতিকে নতুন দ্যোতনায় ও নতুন ব্যঞ্জনায় উজ্জীবিত করে দেশকে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। আত্মহনন ও জিঘাংসার বদলে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রেরণা যোগায়, মেরুদন্ডকে সোজা করে শির উঁচু করতে শিখায়। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত কি বলে? হোমোযেনিয়াস (Homogenous) একটা জাতির মধ্যে যে এত বিভক্তি তা জাতি বিশারদরাও বোধ হয় কখনো দেখেননি।

যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধী

ছোট বেলা থেকেই ঘুরে ফিরে একদল পরিচিত মানুষের মুখে অহরহ শুনে আসছি দুটি শব্দ-যুদ্ধাপরাধ ও যুদ্ধাপরাধী। 'জরুরী অধ্যাদেশ ২০০৭' -এর সময় উক্ত যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অরাজনৈতিক (?) ও জরুরী আব্দারে ইস্যুটি নতুন করে আবার আন্দোলিত হচ্ছে। বিভিন্নভাবে তালিকা তৈরি হচ্ছে। কারো তালিকায় তো প্রফেসর গোলাম আযম থেকে শুরু করে সাবেক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী হয়ে শেখ হাসিনার বেয়াইয়ের নামে এসে ঠেকেছে। যারা খুন, হত্যা, নারী নির্যাতন, বাড়ী-ঘর পোড়ানো থেকে শুরু করে হাজারো অপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিচার কে না চায়? কিন্তু তারা কারা আর কেন এবং কিভাবেইবা তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল?

যুদ্ধাপরাধ কি এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপেডিয়া লিখেছে, যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ (তা সামরিক হোক বা বেসামরিক) কতৃক যুদ্ধ আইন বা যুদ্ধের নীতিমালা ভংগই হল যুদ্ধ অপরাধ। আন্তর্জাতিক আইনে এটি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্ধে যুদ্ধ আইনের প্রতিটি ভায়োলেশনই হলো দন্ডযোগ্য ক্রাইম। তবে আভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহ স্থানীয় আইন দ্বারা বিচার করা যেতে পারে। সংক্ষেপে, যুদ্ধের নীতিমালা হল যুদ্ধ সংক্রান্ত ঐ সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন যা জেনেভা কনভেনশন সমুহের মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ গ্রহন করতে সম্মত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল যুদ্ধবন্দী হত্যা, বেসামরিক জনগন হত্যা, ধর্ষণ, আত্মসমর্পনকারী শত্রু সৈন্য হত্যা, জেনোসাইড বা গণহত্যা, ইত্যাদি।

যুদ্ধাপরাধী হল তারাই যারা (হোক না তারা পাক বাহিনী, রাজাকার, রক্ষী বা লাল বাহিনী) যুদ্ধের উক্ত নীতিমালাসমূহ ভংগ করে মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। উইকিপিডিয়া ১৯০৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সব যুদ্ধের সর্বমোট ৩১০ জনের নামের তালিকা দিয়েছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও বাংলাদেশী কোন অভিযুক্তের নাম পেলাম না। ১৯৭১ এ অভিযুক্তদের স্থানে 'পাকিস্তানী আর্মি এবং এর সহযোগী' লেখা রয়েছে। ন্যাশনালিটি ধরে এগিয়ে ভূতপূর্ব অটোমান সরকারের বাম ৩ জন মন্ত্রী আহমেদ জিমেল পাশা, আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশার নাম পেলাম। বাংলাদেশের কারো নাম প্রস্তুত করতে বোধ হয় আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সম্ভবত এটি উম্মুক্ত করে রাখা হয়েছে সংবিধানের বিভিন্ন দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা উদ্ধারের জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে মীমাংসা করার মত। তথাকথিত সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কিংবা গোল টেবিল আলোচনার মাধ্যমে এটি প্রণয়ন করা হবে। রাষ্ট্রের

প্রয়োজনে সময়ের সাথে সাথে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার কথা বলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা অসম্ভব বিপরীত মতাদর্শের ব্যক্তিদের নিয়ে এ তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। সাবেক সেনাপ্রধান ও মেজর জেনারেলরাও এক্ষেত্রে হয়তোবা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবেন।

সিমলা চুক্তি ও প্যাকেজ ডিল

শ্যামলী দেবীর নামানুসারে ভারতের হিমাচল প্রদেশের মাঝারী সাইজের পর্যটন শহরটি হল সিমলা। এনসাইক্লোপেডিয়া বাংলাদেশ ও এনসাইক্লোপেডিয়া পাকিস্তান ঘেটেঘুটে যা পেলাম তার সার কথা হল, পাক-ভারত সম্পর্ককে সহনীয় ও বন্ধুত্বপূর্ন পর্যায়ে ফেরত নিয়ে আসার জন্য এখানেই বহুল আলোচিত কনফারেন্সটি শুরু হয় ১৯৭২ সালের ২৮শে জুন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টো চুক্তিতে সই করেন। মেজর জলিলের মত সেই একই দীর্ঘশ্বাস বাংলাদেশকে আবারো অপমান অবহেলা। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি কারো স্বাক্ষরের প্রয়োজন পড়ল না। একই বছরের ২৮শে জুলাই চুক্তিটি বৈধতা পেল। আর এটি আইনে পরিনত হল আগষ্টের ৪ তারিখে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত ৯৩ হাজার পাকিস্তানী আর্মিকে চুক্তিতে অনুল্লেখ্য বাংলাপিডিয়ার আশা ইসলামের ভাষায় প্যাকেজ ডিলের আওতায় স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়। প্যাকেজ ডিলটি যে কি বস্তু তা জাতি কোনদিনও জানতে পারবে না এবং এটি নিয়ে কেউ কোন উচচবাচ্যও করবে না। মুজিব সরকার এক লক্ষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলেও দালাল আইনে অভিযোগ আনা হয় ৩৭ হাজার ৪শত ৭১জনের বিরুদ্ধে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে তেমন কাউকে শাস্তি দিতে পারেননি তৎকালীন আদালত। আর সুস্পষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত বাকী ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর জন্য নয়াদিল্লীতে আরেকটি বোঝাপড়া চুক্তি (মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) করা হয় পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের মাস দেড়েক পর ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে। ত্রিদেশীয় তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়গণ ডঃ কামাল হোসেন, সোয়ারান সিং ও আজিজ আহমেদ স্বাক্ষর করে আসল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টিকেও চিরতরে মিটিয়ে দেন।

নিউইয়র্ক থেকে সাপ্তাহিক বাংলাদেশের সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ এ. খান ১৪ই নভেম্বরে দৈনিক ইত্তেফাকে লিখেছেন, “বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত তার “লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড” গ্রন্থে লিখেছেন, শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের জুন মাসেই ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পিএন হাকসারের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। ’৭২ সালে সিমলা শান্তি চুক্তির পূর্বে ভারত পাকিস্তানকে এই মর্মে আশ্বস্ত করে যে, বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে না। ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সিনিয়র উপদেষ্টা ডিপি ধর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে প্রথমদিকে নমনীয় থাকলেও ভারতীয় পেশাদার সেনাবাহিনী কোনভাবেই রাজী ছিলো না পাকিস্তানী পেশাদার সেনা অফিসারদের বিচার হোক। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি এভাবেই নিস্পত্তি হয়ে যায়। যার জন্য পরবর্তীতে সুযোগ থাকা সত্বেও আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করেননি শেখ মুজিব সরকার।“

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, ইনডিয়াকে সাথে করে বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে চুক্তি করতে গিয়ে খোদ বাংলাদেশের প্রসংগটিই ব্যাপকভাবে বারে বারে উপেক্ষিত হয়েছে! পাক-ভারতের মধ্যকার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব রকমের দ্বন্দ্বের অবসান এবং সর্বোপরি কাশ্মিরকে ভারতের প্রদেয় বিশেষ মর্যাদায় পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট থাকার মত ইস্যুগুলোকে সামনে এনে মূলত বাংলাদেশকেই বঞ্চিত করা হয়েছে। পাক-ভারতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ঠিকই শেষের পর্যায়ে, কিন্তু নির্মম সত্য কথা হল আমরা আমাদের থেকেই বেরুতে পারিনি।

ইস্যুটিকে নিজেরাই পাকাপোক্তভাবে মিটিয়ে দিয়ে প্রতিবারই শুধুমাত্র নির্বাচনের আগে (নির্বাচনের পরে কিন্তু নয়) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলে গণতান্ত্রিক দেশে অগণতান্ত্রিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি অন্য কথায় শুধুমাত্র ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার (যা কোন গণতান্ত্রিক দেশ এমন কি পাশের দেশেও নেই) যে দাবী তোলা হয় তার কারন কি? আমাদের কি জন্মই হয়েছে শুধু ২৮শে অক্টোবর আর ২১ শে আগষ্টের দিকে বারে বারে ফিরে যাওয়ার? জাতির কপাল ভালো যে, মাওলানা সাহেবরা পাল্টাপাল্টিভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের কথা বলে এদেশে ধর্মহীন রাজনীতি নিষিদ্ধের জোরালো

দাবী এখন পর্যন্ত উঠাননি। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেই নেই, সব ইসলামী সংগঠনকে এবার নিষিদ্ধ করা হল। তারপর কি হবে? কে কার বিচার করবে? স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হবে? সব নেতাদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে? আর তাদের লক্ষ লক্ষ অনুসারীরা এসব দৃশ্য চেয়ে চেয়ে দেখবে? না জানি তাদেরকেও তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া হবে? না জেলে ভরা হবে অথবা ঝেটিয়ে দেশছাড়া করা হবে? কোনো সত্যিকারের দেশপ্রেমিকরা এসব চিন্তা করতে পারেন? জনগনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে জোর করে জঙ্গীবাদের দিকে ঠেলে দিয়ে জনগনের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন এসব মিডিয়া-বাঘ ব্যক্তিত্বরা সমগোত্রীয় একটা সহনশীল জাতির মধ্যে ঘৃণা ছড়িয়ে প্রকারান্তরে কার স্বার্থ্য চরিতার্থ করতে চান? যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কি আমরা এতই অন্ধ, বধির হয়ে যেতে পারি? সুবিধাবাদী পলিটিশিয়ানদের নিকট এ এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন যার কোনোই উত্তর নেই!

প্রতারিত জনগণ ও গনতন্ত্রের নতুন ডেফিনেশন

আসল কথা হল, ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে কাউকে ব্যবহৃত করতে না পারলেই বারে বারে বোকা জনগনকে স্যান্ডউইচ বানানো হয়। যাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলা হচ্ছে তারা জোট পরিবর্তন করলেই এসব কপট দাবীর অসারতার প্রমান আবারো মিলত। স্বাধীনতার সুফল তিন যুগ পরেও জনগনের দোরগোড়ায় আমরা পৌঁছে দিতে পারিনি বলেই আজো গ্রামের মানুষেরা ৭১ সালকে 'গন্ডগোলের বছর' বলে অভিহিত করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে আপামর জনতার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য কি আমাদের পূর্বসূরীদের কি কোন দায়ভারই নেই?

যেদেশে ভোজ্য তেল, চালসহ অতি প্রয়োজনীয় আহার্যপন্যের দাম এক বছরের মাথায় বেড়ে দ্বিগুন তিনগুন হয়, হালুয়া রুটিও আজ যেদেশে প্রশস্ত দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ, পূর্ণিমা চাঁদকে যেদেশে ঝলসানো রুটি বলে মনে হয়, সেদেশে বারে বারে একই '৭১-র ডোজ দিয়ে দোষারোপের খেলা কি বেঁচে থাকার তাগিদে নিরন্তর সংগ্রামে ব্যস্ত মুটেমুজুরদের নিকট বিলাসীতা নয়? আস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধিকে এখন মিডিয়া সিন্ডিকেট বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারকে দোষছেন আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরা। কারন মাফিয়াকে দোষলে তো আবার জানের পরীক্ষা দিতে হয়। অর্থনীতির ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের জটিল তত্ত্ব কিংবা ভোক্তাদের নিয়ে আর্থ-ব্যাংগাত্বক লুকোচুরি খেলা বুঝি না , সাদামাটা ভাবে শুধু আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের ব্যপ্তি নিয়ে চিন্তা করি। যদি এর পরিধি শুধু প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা দুনিয়াব্যাপী হয় তাহলে দু'কথা বলার আছে। প্রায় সাত বছর হতে চলল আমেরিকা ও কানাডায় থাকা। জ্বালানী তেলের দাম বেড়ে দ্বিগুন হলেও খাবার জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়া চোখে পড়ল না। আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব কি এসব দেশে পড়ে না?

আহা, কতই না মানানসই হত, কোন নেতার কথার চেয়ে ভারী হয়ে সাধারন মানুষদের প্রতিদিনকার রোনাজারি সেক্টর কমান্ডারদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করে এটিকে বার্নিং ইস্যু বানাত! কতই না ভাল হত, যদি রক্তের বিনিময়ে পাওয়া দেশটিতে দু'মুঠো ভাত খেয়ে শান্তিতে ঘুমোনোর জন্য যেন আর রক্ত ঝরাতে না হয় তার জন্য প্রাক্তন এই লড়াকুরা অন্তত একবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিতেন! জাতি কি বিশ্বাস করতে পারে তাদেরকে, যাদের যুদ্ধ ছাড়া সমস্ত অতীতই বিরাট এক প্রশ্নোবোধক চিহ্ন দ্বারা বিদ্ধ? কি করেননি তারা? স্বৈরাচারের লুটের সহযোগী থেকে শুরু করে বারে বারে ভোল পালটিয়ে এদল ওদল বদল করে নিজেদের কোন ইস্পাতদৃঢ় আদর্শের প্রমান রাখতে পেরেছেন?

বর্তমানে হঠাৎ গণতান্ত্রিক হয়ে যাওয়া কিছু বুদ্ধিজীবি ও পত্রিকা সম্পাদকদের সৌজন্যে রং বেরংয়ের দৃশ্য-অদৃশ্যমান অনুঘটক দিয়ে নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য ও আবদার ভিন্ন স্বাদে আমরা গলধঃকরণ করছি। সময় যে দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে! সব কিছুই করার যে এখনই সময়! কারন, যেকোন গনতান্ত্রিক সরকার এমনকি কোন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারই যে এধরনের হঠকারি সিদ্ধান্তে পা বাড়াবে না এটাতো সবার নিকট পরিষ্কার। হয়তো গনতন্ত্রের সংজ্ঞা এবং ভবিষ্যতের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কনসেপ্টই পালটে যেতে পারে। জনগণকে বোকা বানিয়ে পাক তুর্কীর মিশ্রনে দ্রবীভূত এমন এক আপডেটেড ভার্সনের সিভিল-মিলিটারী টেষ্টটিউব গনতন্ত্র আমাদের দেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জন্য মুরব্বীদের প্রেসক্রিপশনে রয়েছে সেটি হল 'ডায়ালগ ও ডিবেট ওরিয়েন্টেড ডেমোক্রেসি'। এ ডেমোক্রেসিতে আইন প্রনয়ন করবে ঘুরে ফিরে এলিট শ্রেণীর দন্ডমুন্ডের মাথারা। গোল টেবিলের আইওয়াশ বাগযুদ্ধ

বৈঠকেই সুশীল সমাজের রহস্যময় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আইনের বৈধতার কাজটিও সমাধা করা হবে। জনগনের সরাসরি অংশগ্রহনের প্রয়োজন পড়বে না। বাংলাদেশকে এই মূহুর্তে টেষ্ট কেইস হিসেবে ব্যবহৃত করা হচ্ছে কি না তা দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ভেবে দেখার সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর ইস্যুসমূহকে পুঁজি করে আবেগের উন্মাদনায় জনগনের দৃষ্টি উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে সরিয়ে দূর্নীতিমুক্ত, আধুনিক, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার বর্তমানে আসা অপার সুযোগটিও হাতছাড়া হওয়ার অশুভ পাঁয়তারা লক্ষ্য করছি।

* যায়যায়দিন ২১শে নভেম্বর ২০০৭ এ প্রকাশিত ।